একজন স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে সরাতে কত মানুষকে রাস্তায় নামতে হয়?

bbc.com/bengali/news-54255224

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

ছবির উৎস, Reuters
ছবির ক্যাপশান, কত মানুষ রাস্তায় নামলে স্বৈরশাসকের পতন ঘটানো সম্ভব?

একজন স্বৈরশাসকের পতন ঘটাতে কোন কৌশল সবচেয়ে বেশি কার্যকরী? সহিংস প্রতিবাদ নাকি অহিংস আন্দোলন? আর ক্ষমতা থেকে কোন রাজনীতিককে সরাতে এরকম বিক্ষোভ কত বড় হতে হবে? কত মানুষকে জড়ো করতে হবে? বিবিসির ডেভিড এডমন্ডসের রিপোর্ট:

হার্ভার্ডের একজন গবেষক এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণা চালিয়েছেন বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের দেশে দেশে যেসব গণআন্দোলন-গণবিক্ষোভ হয়েছে সেগুলোর ওপর।

এই গবেষণার ভিত্তিতে তিনি বলছেন, কোন জনগোষ্ঠীর মাত্র ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ যদি গণবিক্ষোভে যোগ দেন, তাতেই তারা সফল হতে পারেন।

বিগত কয়েক দশকে বিশ্বে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটানোর সফল আন্দোলনের অনেক নজির আছে।

১৯৮০র দশকে কমিউনিষ্ট শাসনামলের পোল্যান্ডে হয়েছিল সলিডারিটি আন্দোলন। এর নেতৃত্বে ছিল শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলো।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলেছে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন। চিলির স্বৈরশাসক অগাস্তো পিনোশের পতন ঘটেছিল গণআন্দোলনের মুখে। সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয় সফল আন্দোলনের মাধ্যমে।

একেবারে অতি সাম্প্রতিককালের উদাহারণও আছে। তথাকথিত আরব বসন্তের সূচনা হয়েছিল তিউনিশিয়ায় স্বৈরশাসক জিনে আল-আবেদিন বেন আলীকে ক্ষমতা থেকে সরানোর মাধ্যমে। সেখানে এই গণঅভ্যুত্থানের নাম দেয়া হয়েছিল 'জাসমিন বিপ্লব।'

মাত্র গত বছর এরকম আরেকটি সফল বিপ্লবের উদাহারণ হচ্ছে সুদান। সেখানে আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে ওমর আল-বশিরকে। একইভাবে আলজেরিয়ায় ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকাকে।

আমাদের স্মরণকালের মধ্যেই ঘটেছে এসব সফল গণআন্দোলন। আর এই আন্দোলনের পথ ধরে এসব দেশে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে।

এই মুহূর্তে বিশ্ব গণমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে আছে বেলারুসের বিক্ষোভ। একটি বিতর্কিত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেংকো নিজেকে বিজয়ী ঘোষণার পর সেখানে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছে। এই বিক্ষোভ দমনে সরকার সেখানে নিষ্ঠুর বল প্রয়োগ করছে। অনেক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বন্দী করে লোকজনের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে এমন অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণই আছে।

কিন্তু এই আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো জরুরি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিকা চেনোওয়েথ ঠিক সেই কাজটিই করেছেন।

আরও পড়ুন:

কে এই আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো 'ইউরোপের শেষ স্বৈরশাসক'

মধ্যপ্রাচ্যে কি নতুন করে আরব বসন্ত শুরু হচ্ছে?

নতুন পাঁচ 'স্বৈরতান্ত্রিক দেশের তালিকায়' বাংলাদেশ

ছবির উৎস, KRIS SNIBBE / HARVARD GAZETTE
ছবির ক্যাপশান, প্রফেসর এরিকা চেনোওয়াথ: 'গণআন্দোলনের সাফল্যের হার কমছে'

প্রফেসর এরিকা চেনোওয়াথ তার গবেষণাটি চালিয়েছেন মূলত স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলোতে, গণতান্ত্রিক দেশে নয়। গণতান্ত্রিক দেশের মতো স্বৈরতান্ত্রিক দেশে সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরানো যায় না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের নীতি যদি অজনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন পরের নির্বাচনে এমন রাজনীতিকদের নির্বাচিত করা যায় যারা প্রতিশ্রুতি দেবেন এই নীতি বাতিলের। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেটা সম্ভব নয়।

তবে সমস্যাটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র আর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে। কোন দেশকে স্বৈরতান্ত্রিক এবং কোন দেশকে গণতান্ত্রিক বলা হবে সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কোন দেশ কতটা গণতান্ত্রিক বা কতটা স্বৈরতান্ত্রিক তার মাত্রা নিয়েও আছে বিতর্ক। আর সহিংস আন্দোলন থেকে অহিংস আন্দোলনকে কিভাবে আলাদা করা যাবে, সেটা নিয়েও আছে নানা মত।

যেমন, ধরা যাক, কোন আন্দোলনের সময় মানুষের সম্পত্তির উপর হামলা করা হলো। এটাকে কি তখন সহিংস আন্দোলন বলা হবে? আর কোন বিক্ষোভ থেকে যদি লোকজন বর্ণবাদী গালি দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু শারীরিক আক্রমণ থেকে তারা বিরত থাকে, সেটাকে কী বলা হবে? অহিংস?

যারা প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মাহুতি দেন কিংবা অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে মৃত্যুর পথ বেছে নেন, তাদেরটাকে কি সহিংস আন্দোলন বলা যাবে?

কাজেই এসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। কিন্তু সাদা চোখে এটা বলাই যেতে পারে, কিছু বিক্ষোভ স্পষ্টতই সহিংস, আর কিছু বিক্ষোভ স্পষ্টতই অহিংস।

যেমন গুপ্তহত্যা নিঃসন্দেহে একটি সহিংস কৌশল। আবার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, দেনদরবার, পোস্টার সাঁটানো, কর্মবিরতি, অবস্থান ধর্মঘট, ওয়াকআউট- এগুলোকে অহিংস আন্দোলনের কৌশল বলে বর্ণনা করা যায়।

অহিংস আন্দোলনের কৌশল নাকি আছে ১৯৮ রকমের।

এরিকা চেনোওয়েথ এবং তার সহযোগী গবেষক মারিয়া স্টেফান ১৯০০ সাল হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বে যেসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়েছে, যেগুলোর সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণার শেষে তারা এমন উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, সহিংস আন্দোলনের চাইতে অহিংস গণআন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে- কেন?

অধ্যাপক চেনোওয়েথের মতে, এর একটা সহজ উত্তর হচ্ছে যখন কোন আন্দোলনে সহিংসতা হয় তখন সেটা সে আন্দোলনের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।

অহিংস আন্দোলনে অনেক বেশি লোক যোগ দিতে আগ্রহী হবে। কারণ অহিংস আন্দোলনে ঝুঁকি কম। এরকম আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য খুব বেশি শারীরিক সক্ষমতা দরকার হয় না। এর জন্য কোন প্রশিক্ষণও দরকার হয় না। এরকম আন্দোলনের জন্য সময় দিতে হয় কম এবং এসব কারণে অহিংস আন্দোলন সবসময় অনেক বেশি মানুষকে আকর্ষণ করে। যেমন নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীরাও এরকম আন্দোলনে যোগ দেয়।

ছবির উৎস, Getty/Bettmann
ছবির ক্যাপশান, চিলির স্বৈরশাসক পিনোশের বিরুদ্ধে একটি গণবিক্ষোভ।

আর আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রেখে সেখানে বেশি সংখ্যায় মানুষের সমাগম ঘটানো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক সার্বিয়ায় স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে বুলডোজার বিপ্লবের কথা।

সেখানে বিক্ষোভকারীদের ওপর সৈন্যরা কেন গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সে প্রশ্নের উত্তরে সৈন্যরা বলেছিল, তারা গুলি চালাতে পারেনি কারণ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তাদের পরিচিতজনরা ছিল।

বিক্ষোভে যোগ দেয়া জনতার মধ্যে যখন তাদেরই ভাইবোন বা বন্ধু বা প্রতিবেশী আছে, সেখানে গুলি চালাতে স্বাভাবিকভাবেই তারা অনিচ্ছুক ছিল।

আর কোন বিক্ষোভ যত বড় হবে, সেখানে যত বেশি মানুষ যোগ দেবে, এমন সম্ভাবনা তত বেশি হবে যে সেই বিক্ষোভে পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরই কোন না কোন পরিচিত লোক থাকবে।

কোন বিক্ষোভে কত মানুষ জড়ো হলে সেটি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে, সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছেছেন প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথ। তাঁর মতে, কোন জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ যখন প্রতিবাদ বিক্ষোভে যোগ দেয়, তখন এটির সাফল্য প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

সংখ্যাটা খুব ছোট মনে হতে, পারে কিন্তু আসলে তা নয়।

বেলারুসের উদাহরণ দেয়া যাক। দেশটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৯০ লাখ। এখন এই জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানে হচ্ছে তিন লাখের একটু বেশি।

বেলারুসের রাজধানী মিনস্কে যে বিক্ষোভ হচ্ছে, সেখানে হাজার হাজার লোক যোগ দিচ্ছে। হয়তো বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা এক লাখ। যদিও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর কোন এক রিপোর্টে একবার বলা হয়েছিল, এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন ২ লাখ মানুষ।

এখন সরকার পতনের জন্য ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষকে বিক্ষোভে যোগ দিতে হবে, এই নিয়মটা একেবারে যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা নয়। অনেক আন্দোলনে এর চাইতে অনেক কম মানুষ যোগ দিলেও তা সফল হয়েছে। আবার কোন কোন বিক্ষোভে এর চেয়ে বেশি মানুষ অংশ নেয়ার পরও তা ব্যর্থ হয়েছে।

যেমন বাহরাইনে ২০১১ সালে যে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল, সেটার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথের মূল যে গবেষণা, সেখানে তারা ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংঘটিত আন্দোলন-বিক্ষোভ নিয়ে কাজ করেছেন।

তবে তারা এখন গবেষণার দ্বিতীয় একটি পর্যায় সম্পন্ন করেছেন যেখানে সাম্প্রতিককালের গণবিক্ষোভগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তার নতুন গবেষণার ফল আগের গবেষণার ফলকেই কেউ সমর্থন করছে।

ছবির উৎস, Getty/Franck Prevel
ছবির ক্যাপশান, তিউনিসিয়ায় বেন আলির শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। এখান থেকেই আরব বসন্তের সূচনা

যেমন, এই গবেষণার ফলও বলছে, অহিংস আন্দোলন আসলেই সহিংস আন্দোলনের চাইতে বেশি সফল হয়।

তবে নতুন গবেষণায় তিনি গণবিক্ষোভের দুটি মজার ট্রেন্ড বা ধারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

প্রথমটি হচ্ছে, দুনিয়াজুড়েই অহিংস প্রতিরোধ এখন আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধারা হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সশস্ত্র আন্দোলনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এখন অহিংস আন্দোলনের সংখ্যা।

গবেষণায় তিনি দেখেছেন, ২০১০ হতে ২০১৯ সালের মধ্যে এক দশকে বিশ্বে যে পরিমাণ অহিংস গণআন্দোলন হয়েছে, লিখিত ইতিহাসে সেরকম সংখ্যায় অহিংস আন্দোলনের নজির আর কোন দশকে নেই।

গবেষণায় তার চোখে ধরা পড়া দ্বিতীয় আরেকটি ধারা হচ্ছে, আন্দোলনের সাফল্যের হার কমে গেছে।

এই সাফল্যের হার সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে কমেছে সহিংস আন্দোলনের বেলায়। প্রতি দশটি সহিংস আন্দোলনের নয়টি এখন কার্যত ব্যর্থ হচ্ছে, বলছেন প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথ।

আর অহিংস আন্দোলনও এখন আগের তুলনায় কম সফল হচ্ছে। আগে প্রতি দুটি অহিংস আন্দোলনের একটি সফল হতো। আর এখন প্রতি তিনটি আন্দোলনের একটি সফল হচ্ছে।

তবে ২০০৬ সালের পর বেশ নাটকীয় কিছু সাফল্য দেখা গেছে। যেমন, সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির ২০১৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুল আজিজ বুতেফ্লিকাকে ক্ষমতা ছাড়তে হয় তীব্র গণআন্দোলনের মুখে।

কিন্তু এরকম আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসকদের ক্ষমতা ছাড়ার ঘটনা ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে।

এটার কারণ কি?

ছবির উৎস, Valery Sharifulin
ছবির ক্যাপশান, বেলারুসে আন্দোলন কি সফল হবে?

এর হয়তো অনেক ব্যাখ্যা আছে।

তবে একটা কারণ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল বিপ্লব। এটা একটা দুধারী তলোয়ারের মতো।

প্রথম কয়েক বছরে মনে হচ্ছিল ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসার মানুষের হাতে প্রতিবাদ সংগঠিত করার এক শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এই নতুন প্রযুক্তি তথ্য আদান-প্রদান অনেক সহজ করে দিয়েছিল।

কখন, কোথায় বিক্ষোভ করতে হবে - কখন, কোথায় পরবর্তী মিছিলটি হবে - এসব খুব সহজ হয়ে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে।

কিন্তু স্বৈরশাসকরা এখন এই সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের নিজেদের অস্ত্রে পরিণত করতে পেরেছে। এরা এখন সফলভাবে এটি ব্যবহার করছে তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে।

প্রফেসর এরিকা চেনোওয়েথ বলছেন, ডিজিটাল অর্গানাইজিং, অর্থাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিক্ষোভের আয়োজন করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ এর ওপর এখন সাংঘাতিক নজরদারি চলে। এতে অনুপ্রবেশ ঘটানো সহজ। আর সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে সরকার নিজেই এখন তাদের নিজেদের প্রোপাগান্ডা চালায় এবং ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়।

আবার বেলারুসে ফিরে আসা যাক।

সেখানে যেসব বিক্ষোভকারীদের বন্দী করা হচ্ছে, তাদের টেলিফোন নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। এর লক্ষ্য টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বিক্ষোভকারীরা কোন চ্যানেল ফলো করে, সেটা খুঁজে বের করা। টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে এই চ্যানেল চালায় যেসব বিক্ষোভকারী, তারা আটক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য টেলিগ্রাম তাদের একাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে। যাতে করে এই চ্যানেল কারা ফলো করে পুলিশ সেটা খুঁজে বের করতে না পারে।

বেলারুসের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেংকো কি এই যাত্রায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন?

তার বিরুদ্ধে যখন এরকম ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তখন কি আর তিনি রক্ষা পাবেন?

হয়তো নয়।

তবে আগের ইতিহাস দেখলে মনে হচ্ছে, মিস্টার লুকাশেংকোকে একেবারে খরচের খাতায় লিখে ফেলার সময় হয়তো এখনো আসেনি।